Vol. 49 | No. 2 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় গ্রামজীবন : যাপন-পদ্ধতির বিকল্প প্রস্তাব ও কাব্যের রাজনীতি

| | |
|---|---|
| Volume | 49 |
| Issue | 2 |
| Year | 2012 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | Mohammad Azam |
| Published online | February 1, 2012 |
| DOI | 10.62328/sp.v49i2.1 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v49i2.1 |
| Pages | ০৯-২৮ |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

# জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় গ্রামজীবন : যাপন-পদ্ধতির বিকল্প প্রস্তাব ও কাব্যের রাজনী

Check for updates

মোহাম্মদ আজম*

পল্লিজীবনের রূপকার হিসাবে কবি জসীমউদ্‌দীন কমবেশি প্রশংসিত হয়েছেন। এই প্রশংসার মধ্যে 'আধুনিক' বাংলা কাব্যের একটি অভাব পূরণের কৃতিত্বের কথা বারবার বলা হয়েছে। অভাবটি হলো ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাব্যধারায় বাংলার গ্রামজীবনের বিস্তারিত ও বাস্তবভিত্তিক উপস্থাপনার অভাব। অপেক্ষাকৃত গৌণ কবিদের কারো কারো রচনায় এ বস্তু থাকলেও উচ্চারণের বলিষ্ঠতা ও সমগ্রতায় জসীমউদ্‌দীনই কেবল বাংলা কাব্যসমালোচনার মূল ধারায় খানিকটা সমীহ আদায় করতে পেরেছেন। কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ সমীহ আদায় হয়েছে, তাতে অন্তত দুটি বড় খুঁত রয়ে গেছে। সমালোচকদের একাংশ খেয়াল করেছেন, তাঁর কাব্যচর্চার ফলে বাংলা কবিতায় নাগরিক জীবনের পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনও পাওয়া গেল। অর্থাৎ তাঁর গ্রামজীবন একটি সামগ্রিক জীবনবোধের একাংশ মাত্র। কোনো কাব্যধারার একজন কবির জন্য এই স্বীকৃতিও মোটেই হেলাফেলার নয়। কিন্তু মুশকিল হলো, এই সমালোচকেরা একই সাথে জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় 'আধুনিকতা'র লক্ষণ না দেখে পীড়িত বোধ করেছেন। উপনিবেশিত শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের জন্য 'আধুনিকতা' একটা বেশ প্রতারক ধারণা, যার খোঁজ করতে গিয়ে তাঁদের চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছে অধিকতর মূল্যবান অনেক কিছু। যেমন, কবি হিসাবে জসীমউদ্‌দীনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন এমন সমালোচকদের অপর অংশ বিভিন্নভাবে দেখাতে চেয়েছেন, জসীমউদ্‌দীন 'পল্লিকবি' হলেও 'আধুনিক'। সম্ভবত সারা পৃথিবীতে — এবং এই উপনিবেশিত বাংলায়ও — 'আধুনিকতা'র ধারণার সাথে একাট্টা হয়ে আছে নগর, গ্রাম যেখানে স্মৃতি কিংবা সৌন্দর্যের উপকরণ মাত্র; অথবা বলা যাবে 'সংস্কৃতি'র বিপরীতে 'প্রকৃতি'। এ মাপকাঠিকে চ্যালেঞ্জ না করে জসীমউদ্‌দীনকে 'আধুনিক' বলতে গেলে আশ্রয় নিতে হয় একরাশ গোঁজামিলের। আমাদের সমালোচকদের ওই অংশ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় গোঁজামিলে ভর করেছেন।

এ লেখায় সংক্ষেপে দেখানো হবে, জসীমউদ্‌দীন কোনো জীবনসমগ্রের একাংশের চর্চা করেননি, বা 'আধুনিক' ভঙ্গিতে গ্রামকে উপস্থাপন করতে চাননি। গ্রামীণজীবন তাঁর কবিতায় বিকল্প জীবনবোধ ও জীবনপদ্ধতি। সে জীবন একদিকে সমগ্রতায় সম্পূর্ণ, অন্যদিকে শ্রী ও শোভায় সম্পন্ন। তা নগরজীবনের সাথে পাশাপাশি অবস্থান করে না, বরং নগরকে অগ্রাহ্য করার এবং সমালোচনা করার শক্তি ধরে। যাপনের রাজনীতি আর কাব্যের রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর অবস্থান খুবই জোরালো এবং অতি স্পষ্ট।

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

## ১

একজন সমালোচক সম্প্রতি খেয়াল করেছেন, 'জসীমউদ্‌দীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গলার কাঁটা হয়ে বিঁধে আছেন' (ফরহাদ ২০০৪ : ৩৬১)। এর কারণ, যাকে আমরা কালগত বা ভাবগত দিক থেকে 'আধুনিক' কবিতা বলে সমীহ করি, জসীমউদ্‌দীনের কবিতা তার সাথে ঠিক খাপ খায় না। আসলেই আমাদের পরিচিত 'মূলধারা'র দেশি-বিদেশি কাব্যধারার সাথে তাঁর কবিতার ফারাক এত বিরাট যে, তাঁর কবিতা পড়ার জন্য একটা আলাদা নিক্তিই দরকার হয়। উপনিবেশ আমলের বাংলা কবিতায় নগরজীবনের আধিপত্যের বিপরীতে তাঁর কবিতায় পাই গ্রামজীবনের অবিরল উপস্থাপন। 'জসীমউদ্‌দীন সর্বতোভাবে গ্রামীণ, সমগ্রভাবে গ্রামীণ, অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রামীণ। পাঁচ দশকের অধিককাল ধরে তাঁর সমস্ত কবিতা তো এর সাক্ষ্য বটেই, তাঁর তাবৎ গদ্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ ও গবেষণা, পল্লীগীতি, লোকসাহিত্য সংগ্রহ, লোকনাট্য এর সাক্ষ্য দেবে। সব-মিলিয়ে জসীমউদ্‌দীন তাঁর একাগ্র ও অনবচ্ছিন্ন ও অখণ্ড চারিত্র নির্মাণ করেছেন — যার দ্বিতীয় কোনো নজির আধুনিককালে কেন, কোনোকালেই নেই' (আবদুল ১৯৯৩ : ৮৯)। হাসান হাফিজুর রহমান লিখেছেন, 'এ-ব্যাপারে তিনি ধারাবাহিক, অবিচ্ছিন্ন এবং সর্বাত্মকরূপে নিবিষ্ট ও এককেন্দ্রিক পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন, যা এতদ্‌সংক্রান্ত সচেতনতায় প্রতীকের মতো মর্যাদা পেতে পারে' (হাসান ১৯৯৩ : ৩২০)।

গ্রামীণ জনপদের সমস্ত অস্তিত্বে জসীমউদ্‌দীনের পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। এই পাণ্ডিত্য অর্জিত হয়েছে তাঁর জীবনযাপনের স্বাভাবিক বাস্তবতা আর প্রবণতার মধ্য দিয়েই। 'বৃহত্তর বাংলার কৃষকসমাজ ও তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে জসীমউদ্‌দীনের পরিচয় ঐতিহাসিক কারণেই প্রত্যক্ষ ও নিবিড়। গ্রাম-বাংলা ও তার সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য তাঁর কবিতার শুধু উপকরণ নয়; প্রেরণাও বটে' (আবু হেনা ২০০৪ : ২১৬)। পল্লির কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যেই তিনি জন্মেছিলেন; তাঁর বেড়ে ওঠার দিনগুলোও এখানেই কেটেছিল। পরে শিক্ষা ও কর্মসূত্রে গ্রাম ছাড়লেও গ্রামের সাথে তাঁর নাড়ির যোগ কখনোই ছিন্ন হয়নি। 'বরং লোকগীতি-গাথার সংগ্রাহক হিসাবে দীর্ঘদিন বাংলার পল্লিতে পল্লিতে ঘুরে লোকসাহিত্যের সম্পদ সংগ্রহকালে তিনি পল্লিকে আরো ব্যাপকভাবে, নিবিড়তর করে জানতে পেরেছিলেন' (সুনীলকুমার ২০০৪ : ৪৮)। আবার 'পল্লীর কৃষিজীবী সমাজের নিম্নবিত্ত ঘরের সন্তান ছিলেন তিনি; বিত্তগত দিক থেকে তিনি গ্রামের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, স্বল্পবিত্ত সাধারণ মানুষদেরই অন্তর্গত ছিলেন' (সুনীলকুমার ২০০৪ : ৫০)। ফলে চাষি ও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের অন্তরঙ্গ হতে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু এ সবই বাইরের দিক। অন্তর্গত আবেগ ও প্রেরণার বিশিষ্টতা ছাড়া কাব্যধর্মের এই আয়োজন কিছুতেই সম্ভব হয় না। জসীমউদ্‌দীনের গদ্যরচনার বরাত দিয়ে নিশ্চিত করে বলা যায়, খুব সচেতনভাবেই তিনি তাঁর পথ ঠিক করে নিয়েছিলেন, এবং অভিজ্ঞতার যে ভাণ্ডার তাঁর তহবিলে ছিল তাকে কাব্যে রূপ দিয়েছিলেন।

এবং তিনি সফল হয়েছিলেন। পল্লি নিয়ে কবিতা লিখেছেন আরো অনেকে। গ্রামবাংলার অনুল্লেখিত বিপুল কবিসমাজের বাইরেও 'মূলধারা'র কবি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রমুখ। 'অনুজ

জসীমউদ্‌দীন পল্লীকবি হিসেবে এঁদের অতিক্রম করেছেন সর্বার্থে' (আবদুল ২০০৪ : ৩১৯)। আগে-পরের সবাইকে পেছনে ফেলে তিনিই হয়ে উঠেছেন এ ধারার কাব্যের নায়ক।[১]

## ২

কবিতায় বাংলার যে গ্রামকে হাজির করেছেন জসীমউদ্‌দীন, ধরনের দিক থেকে তা গল্পের সোনার বাংলা বা বেশুমার ঐশ্বর্যে ভরা কোনো বসতি নয়। তাঁর বর্ণনায় উচ্ছ্বাস বা অতিশায়ন খুবই সুলভ; কিন্তু সে অতিশায়ন গ্রামজীবনের উপর বেগানা রং ছড়িয়ে তাকে অচেনা করে তোলেনি। তাঁর অতিশায়ন ব্যাপক অর্থে অলংকারবিশেষ। একে তিনি কাজে খাটিয়েছেন প্রধানত বিশেষ দৃশ্যপট বা অনুভূতির স্বরূপ উদঘাটনে। ব্যক্তির চোখে সকালের শিশিরভেজা মাঠ, সরষে ফুলের বিপুল বিস্তার কিংবা নমুদের উচ্ছল কন্যাটি নিদারুণ সৌন্দর্যের বার্তা নিয়ে হাজির হতেই পারে। মানুষের প্রাণাবেগের দিক থেকে একে অবাস্তব বলা যায় না। কিন্তু অতিশায়নের বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও জসীমউদ্‌দীনের গ্রাম দুঃখ-দারিদ্র্য, অনুরাগ-বিরাগ এবং শ্রী-শোভার নিখুঁত তত্ত্বাবধানে অতিশয় বাস্তব। 'লোক-সংস্কৃতির জীবনমুখী ও মরমী দুটি ধারা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করলেও তাঁর কাব্যস্বভাবের মূল বাস্তবতার গভীরেই নিবদ্ধ। লোকাতীতের চেয়ে লোকায়তের প্রতি তাঁর তীব্রতর আকর্ষণ' (আবু হেনা ২০০৪ : ২২১)।[২]

তিনি বিরামহীনভাবে এঁকে গেছেন পল্লিবাংলার ছবি। সমগ্র পল্লির, পল্লিজীবনের — যে পল্লি কোনোরূপ বিচ্ছিন্নতা দ্বারা আক্রান্ত নয়। *রাখালী* কাব্যের 'রাখাল ছেলে' কবিতায় দেখি, গ্রাম-বাংলার নায়ক রাখাল সারা দিনমান ঘর, মাঠ, প্রকৃতি আর লাঙলের সাথে মিলেমিশে আনন্দময় জীবনযাপন করছে। তাই অবসর-বিনোদনের আলাদা কোনো ধারণাই তার কাছে অপ্রয়োজনীয়। এ জীবন গ্রামীণ উৎপাদন-ব্যবস্থার চৌহদ্দিতে এমন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন, যা শ্রমবিভাজন বা সময়-বিভাজন দ্বারা তাড়িত নয়।

বিচ্ছেদ ঘটেনি প্রকৃতি আর মানুষের সমঝোতায়ও। জসীম 'পরিবেশের সঙ্গে পরিবেশের মানুষকেও তুলে ধরেছেন। এ জন্য সমগ্রতার দিক দিয়ে জসীম প্রকৃতই অনন্য' (দেওয়ান ২০০৩ : ১১)। এমন নয় যে, জসীমউদ্‌দীনের মানুষ প্রকৃতির সন্তান; কিন্তু তাঁর মানুষেরা প্রকৃতির সাথে যাপন করে এক স্বাভাবিক যৌথজীবন। এ জীবন তত্ত্বনির্মিত নয়, নয় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের তপোবন-শাসিত আরণ্যক জীবন। সংস্কৃত সাহিত্যে কিংবা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতির নানাবিধ আভরণ ও সমৃদ্ধির উল্লাসকে একটি পরিকল্পিত উপস্থিতি হিসাবে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, জসীমউদ্‌দীনের সাথে তার ফারাক বিস্তর। এ প্রকৃতি তার নিজের বস্তুধর্ম ও বাস্তবধর্ম বজায় রেখে একীভূত আচরণ করে বাস্তব মানুষের সাথে। এ দুটি যেখানে একসাথে মিলেছে, সেখানকার নির্মাণকলা বড়ই সুন্দর। যেমন, 'রাখাল ছেলে' কবিতার দুটি চরণ :

> ঝাউয়ের ঝাড়ে বাজায় বাঁশী পউষ-পাগল বুড়ী,
> আমরা সেথা চষতে লাঙল মুর্শীদা-গান জুড়ি।

প্রকৃতির নিজস্ব সুর আর মানুষের গান একে অন্যের পরিপূরক হয়ে এখানে যৌথজীবনের শর্ত তৈরি করেছে। বাতাসের স্বাভাবিক আশকারায় ঝাউয়ের পাতায় জন্মেছে সুর। সেই সুরের কর্তা হয়েছে রূপকথার বুড়ি। সঙ্গে তাল মিলিয়েছে রাখাল বালকের মুর্শিদি গান। এমন অনায়াস সহজতায় এ উচ্চারণ সম্পন্ন হয়েছে যে সহসা এর ভঙ্গিটি চোখেই পড়ে না। *রাখালী* কাব্যের 'শাক তুলুনী' আরেকটি কবিতা, যেখানে প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থান একটি মাপ-মতো ক্যানভাসে ধরা পড়েছে। মটরশাক তুলতে এসে গ্রাম্যবধূ তার অবয়ব আর নড়াচড়া নিয়ে একাকার হয়ে গেছে 'ফাগ-রাঙা বউ মটরশুটি'র সাথে। এরূপ সমরূপতা জসীমসমগ্রের এক কুললক্ষণ।

কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই এমন নয় যে, এগুলো গ্রামীণ জনপদে ঠিক এই রূপেই দশের চোখে পড়ার অপেক্ষায় পড়ে ছিল। কোনো ক্ষেত্রেই তা হয় না। বাস্তবতা সব সময়ই আবিষ্কার করতে হয়, গোছাতে হয় — খণ্ড টুকরাগুলো বাছাই করে সাজাতে হয়। জসীমউদ্‌দীনকেও তাই করতে হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেনের বিখ্যাত প্রশংসাপত্র থেকে একটা অংশ পড়া যাক : 'পাড়াগাঁয়ের দুটি ডাগর চোখ, পল্লী রাখালের চোখ জুড়ানো কালোরূপ, মুসলমান লেঠেলদের মারামারি — বাঙ্গালীর বিবাহবাসর, গিন্নীর ঘর-কান্না এই সকল দৃশ্যে বুক জুড়াইয়া গেল। এই পল্লী-দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ছিল — এখনও হয়ত কিছু কিছু আছে। কিন্তু এ সকল হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। এই হারানো জিনিস নূতন পাওয়ার যে আনন্দ, কবি জসীমউদ্‌দীন তাহা আমাদিগকে দিয়াছেন। ... ইনি কবিতারাজ্যে যে পাঠশালা খুলিলেন, তাহা ইহার নিজের আবিষ্কার' (দীনেশ ১৯৯৮ : ১০)। এ অংশে অন্তত দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শনাক্তি আছে। এক. জসীমউদ্‌দীন প্রায়-হারিয়ে-যাওয়া এক বাস্তবের পুনর্নির্মাণ করেছেন। তুলনীয় : *শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব* বইতে হুমায়ূন কবির শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব হিসাবে এই সাফল্যের কথা বলেছেন। দুই. কবিতার এই পাঠশালা তাঁর নিজের আবিষ্কার। নিঃসন্দেহে জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় আছে কাব্যিক গ্রাম আর গ্রামীণ কাব্য আবিষ্কারের মহিমা, যে গ্রাম একই সাথে উৎস ও লক্ষ্য হিসাবে গ্রাম-বাংলার ইতিহাসের আওতার মধ্যেই কাজ করে গেছে — আর বলা অসম্ভব নয় যে, সে ইতিহাসই আসলে বাংলার ইতিহাস।

এই গ্রামেরই ছবি এঁকেছেন তিনি — ছবিই এঁকেছেন। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অবহেলিত কিন্তু সুচেতন সমালোচক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের একবার মনে হয়েছিল, নজরুল ইসলামের পর জসীমউদ্‌দীনের আবির্ভাব যেন গায়কের পর চিত্রশিল্পীর অভ্যুদয়' (আবদুল ১৯৯৩ : ৮৬)। তাঁর একটি কাব্যের নাম *নক্সী কাঁথার মাঠ*। এই নাম কম-বেশি তাঁর প্রায় সব কবিতার বেলাতেই খাটে। তাঁর কবিতা মূলত আখ্যান ও বর্ণনাধর্মী। 'তিনি যে শুধু তাঁর দীর্ঘ কাহিনিকাব্যগুলোতেই কাহিনি বলেছেন, তাই নয়; তাঁর অধিকাংশ খণ্ডকবিতাও কাহিনিকবিতা' (হুমায়ুন ১৯৮৮ : ৪০)। কাহিনির বড়সড় পরিসরের মধ্যে খানিকটা ধীর লয়ে তিনি এঁকে যান গ্রামের ছবি — গ্রামই তার জীবন, প্রকৃতি, স্থিতি, মৃত্যু ও লড়াইসহ অঙ্কিত-এক-রূপবতী হয়ে ওঠে এ কাঁথায়। সাজুর মতো *সোজন বাদিয়ার ঘাট* কাব্যের দুলীও আঁকে। যে বেদনা তারা স্বয়ং নিজেদের জীবনে এঁকেছে, ভোগ করেছে মর্মে-মজ্জায়, তা নিজেদের জন্য আঁকার দরকার ছিল না। তাদের কাছে এটি শিল্পকর্ম নয়, জীবন-বিযুক্ত

উপভোগের উপাদান নয়। তবুও যে এরা আঁকে, সময় ও শ্রমের নিবেদনে নিজের গোপনকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে, তা আসলে নিজেকে অপরের কাছে পেশ করার কৌশল। বৈশিষ্ট্য ও ঝোঁকের দিক থেকে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যকৌশলও অনুরূপ। বিস্তীর্ণ জনজীবনের ছবি এঁকেছেন তিনি — কোলাজ বা নকশা নয়, রঙ-চড়ানো পুরাদস্তুর ছবি; সজীব প্রকৃতি আর সচল মানুষের ঈষৎ আলস্যমাখা আনাগোনা।

এই ছবি আঁকায় সরল কথ্য বাংলার কথকতার ভঙ্গিটিই তিনি অবলম্বন করেছেন। 'আধুনিক' সমালোচকদের অযথাই জসীমউদ্‌দীনের কবিতার ভাষা ও শব্দব্যবহার নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা করতে হয়েছে।[৩] আসলে বাংলা সাহিত্যের 'মূলধারা' ও সাহিত্যিক বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর ধারণা (উদাহরণস্বরূপ তাঁর 'গণ-সাহিত্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য; জসীম ২০০১) এত পরিচ্ছন্ন এবং প্রত্যয়ী ছিল যে, ভাষা ও প্রকরণের ব্যাপারে তাঁকে আলগা কসরত করতে হয়েছে বলে মনে হয় না। আবু হেনা মোস্তফা কামাল জসীমউদ্‌দীনের গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্যগুলোকে সাজিয়েছেন এভাবে : এক. তা আপাতদৃষ্টিতে সাধুরীতি আশ্রিত হলেও মেজাজে সম্পূর্ণতই কথ্যরীতি নির্ভর; দুই. কবিতার মতো তাঁর গদ্যও প্রধানত বর্ণনাধর্মী ও চিত্রগুণসম্পন্ন; এবং তিন. তাঁর গদ্যরচনার নেপথ্যে অধুনালুপ্ত গ্রামীণ কথকতার ভঙ্গি। (আবু হেনা ২০০৩ : ৫৪)। এই কথ্যরীতি-নির্ভরতা, চিত্রাত্মক বর্ণনাধর্মিতা আর কথকতার ভঙ্গি — তাঁর কাব্যভাষারও মূল।

বাংলার চলমান কাব্যধারা ও গানে কথকতার যে ভঙ্গিটি নিজস্ব ঘরানার কেজো উচ্চারণে বিকশিত হয়েছে, জসীমউদ্‌দীন তাকেই মান্য করেছেন। রূপক ও অতিশায়ন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য এবং উপনিবেশ আমলের 'প্রান্তীয়' কবিতা-গানে খুবই সুলভ। জসীমউদ্‌দীন সেই ধারাতেই চলেছেন। ফলে তাঁর কবিতায় অবিরল উৎসারিত হয় রূপকের পর রূপক, আর গ্রাম্য মেয়ে সাজু অবলীলায় হয়ে ওঠে 'হল্‌দে পাখির ছা'। বাউল গানের ভাবে-রূপে তাঁর নিবিড় যোগ, বৈষ্ণব কবিতার রসপ্রবাহেও তিনি গা ভাসিয়েছেন; কিন্তু তাঁর আত্মীয়তা *মৈমনসিংহ গীতিকার* মতো লোকগাথা কিংবা মঙ্গলকাব্যের মতো জীবনগাথার সাথেই বেশি। আরেকটি রচনাধারাকে তিনি নিজের সম্পদ বলে গণ্য করেছেন — ভাটিয়ালি-মুর্শিদি-ভাওয়াইয়া গানের বহমান স্রোতধারা।

অন্যদিকে উপনিবেশ আমলের প্রধান কবিদের ভাষা ও অলংকার যেসব নয়া ছাঁদ আয় করে নিয়েছে, জসীমউদ্‌দীন তাতেও ভাগ বসিয়েছেন। তাঁর কবিতায় 'মুখখানি তার নতুন চরের মতো' কিংবা 'মন সে ত নহে কুমড়ার ফালি, যাহারে তাহারে/কাটিয়া বিলান যায়' প্রভৃতি অপূর্ব অর্থালংকারের সুচারু বিন্যাস 'আধুনিক' কবিতার পাঠকদেরও মন কাড়ে।[৪] তবে এই অলংকার-চঞ্চল কবি মূলত প্রচলিত ও ব্যবহৃত অলংকারের প্রতাপেই গড়েছেন তাঁর কাব্যসৌধ। তাঁর কবিতা বর্ণনাত্মক আর সরল, এবং এর জন্য দরকার ছিল এমন বর্ণনাভঙ্গি, যা বাংলা কবিতার অতীত অভ্যস্ততা ও সতেজ সরলতাকে মান্য করে রূপ নেবে স্বভাবোক্তির। নমুদের মেয়ে দুলীর রূপবর্ণন খণ্ডটি এই সহজিয়া কবিত্বের এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত :

ধানের আগায় ধানের ছড়া, তাহার পরে টিয়া,
নমুর মেয়ের গায়ের ঝলক সেইনা রঙ নিয়া।
দূর্বাবনে রাখলে তারে দূর্বাতে যায় মিশে,
মেঘের খাটে শুইয়ে দিলে খুঁজে না পাই দিশে। (*সোজন বাদিয়ার ঘাট*, এক)

এখানে গ্রামবাংলার সুপরিচিত উপাদানগুলোতে কবি দুলীকে সাজিয়েছেন। সহজলভ্য অথচ আকর্ষণীয় উপকরণের সাথে মিলিয়ে দুলীকে উপস্থাপন করতে গিয়ে অতিশয়োক্তির আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। কিন্তু বাংলা কবিতার অতীত চর্চার সাপেক্ষে এ উল্লেখ একদিকে যেমন স্বাভাবিক, অন্যদিকে তেমনি গ্রামীণ ঘর-গেরস্থালির অতি আপন। অন্যত্র, রূপাইয়ের কালো রঙের মহিমা বোঝাতে কবি নিজেকে সঁপে দিয়েছেন বৈষ্ণব পদাবলির প্রতিষ্ঠিত ছকে :

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দাঁতের কালি দিয়েই কেতাব কোরাণ লিখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়। (*নক্সী কাঁথার মাঠ*, দুই)

এই বর্ণনাটি বৈষ্ণব ঘরানার কালা-বন্দনার স্মৃতি-সূত্রে একটা প্রসারিত আলাদা তাৎপর্য পায়।

অর্থাৎ, যে কোনো চরিত্রবান ও প্রত্যয়ী কবির মতো জসীমউদ্‌দীনের কবিতায়ও আছে ভাব ও রূপের অচ্ছেদ্য বন্ধন। তাতে পুনরাবৃত্তি আছে, প্রথানুগত্যও আছে; কিন্তু সমর্থ কবির বাকচাতুরি আর নতুনতারও কমতি নাই। নমুনা হিসাবে তাঁর কবিতার অতি পরিচিত দুটি অংশ উপস্থিত করা যাক। *নক্সী কাঁথার মাঠ* কাব্যে রূপাইয়ের রূপবর্ণনার দুটি ছত্র নিম্নরূপ :

জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু,
গা খানি তার শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু।

এ দুই চরণে যে উপমা দুটি রূপাইকে দৃশ্যমান করার জন্য ব্যবহৃত হলো, তাদের সাদৃশ্যের প্রকৃতি কী? 'জালি লাউয়ের ডগা' ও 'বাহু'র মিলের কারণটি এখানে উপস্থিত। কিন্তু রূপাইয়ের কর্মতৎপরতা ও পেটানো শরীরের যে বর্ণনা পরের অংশে আছে, তার সাপেক্ষে 'সরু' বিশেষণটি নিতান্তই বিসদৃশ এবং যুক্তিহীন। ফলে সাধারণ ধর্মবাচক বিশেষণটির আভিধানিক অর্থ ভুলে যাওয়া বা পাশ কাটানো ছাড়া উপায় থাকে না। আমরা অনুভব করি, শব্দটি সম্ভবত সজীবতা, লকলকিয়ে বেড়ে ওঠা বা এমন আরো অনেক বিশেষণের গোপন প্রতিনিধি। প্রতিনিধিত্ব অনির্দিষ্ট বলেই বেশি আকর্ষণীয়। 'আধুনিক' জমানার অনেক কবি মিলবাচক শব্দকে গরহাজির রেখে কিংবা উপমান-উপমেয়ের আপাত অমিলকে জোরালো করে পাঠককে আমন্ত্রণ জানায় গভীরতর মিল আবিষ্কারে। কিন্তু জসীমউদ্‌দীন — সম্ভবত বস্তুকে দৃষ্টিগোচর করে হাজির করার স্বভাবের কারণেই — রেখেছেন একটি নিরীহ বা বহু-অর্থক বিশেষণ, আর এভাবেই তৈরি করতে পেরেছেন অধিকতর কাব্যিক সৌন্দর্য। দ্বিতীয় চরণে আছে শ্রাবণ মাসের তমাল তরুর সাথে গায়ের তুলনা। এই তমাল তরু কি বৃষ্টি-

ভেজা? এ কি কালো রঙের? তাতে কি মেঘের ছায়া পড়েছে? বর্ষার পানি পেয়ে এই বৃক্ষ কি সুঠাম হয়ে উঠেছে? না কি এ তমাল তরু এসেছে পুরানা গল্পের স্মৃতি হয়ে? রূপাইয়ের গা ঠিক কোন অর্থে তমাল তরুর মতো, তা এক কথায় বুঝে ওঠা প্রায় অসম্ভব। অথচ এই বুঝের অভাব চরণগুলোর সঞ্চারিত হওয়াও ঠেকাচ্ছে না। কবিতার চেনা বা আধ-চেনা যে কোনো সংজ্ঞাতেই এগুলো খাঁটি কবিত্বের নমুনা।

'রাখাল ছেলে' কবিতার দুটি চরণ এরূপ :

সরষে বালা নুইয়ে গলা হল্‌দে হাওয়ার সুখে
মটর বোনের ঘোমটা খুলে চুম দিয়ে যায় মুখে!

এখানে একটি নজরকাড়া চিত্র আছে। সে চিত্রের ভিতরে সূক্ষ্মতা, অতিশায়ন এবং রূপকের কারসাজি একত্রে কাজ করে গেছে। কিন্তু প্রথম চরণে 'হাওয়া'র বিশেষণ হিসাবে 'হল্‌দে' শব্দটি খানিকটা বাড়তি কিছু হয়ে আমাদের নজর কাড়ে। বিস্তৃত মাঠে সরষে ফুলের বিপুল সম্ভার সহসা চোখে যে প্রতাপ তৈরি করে, তার ইফেক্ট আনতেই বোধ করি কবি রঙহীন বাতাসে হলুদকে চারিয়ে দিয়েছেন। আসল কথা, জসীমউদ্‌দীন ভঙ্গিসর্বস্ব তো ননই, ভঙ্গিপ্রধানও নন। তাঁর বলবার কথা আছে। মানানসই ভাষা ও কারিগরিতে তিনি সেই কথা বলে গেছেন।

তাঁর অলংকার যে কাজ করেছে লক্ষ্যের অনুকূলে, তার উত্তম নজির পাওয়া যাবে সমাসোক্তি অলংকার পরীক্ষা করলে। এই অলংকারটি নিজেই কাব্যিক, আর অন্য অনেকের তুলনায় জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় এর ব্যবহার বেশি। কিন্তু অলংকারটি তাঁর কবিতায় আরো একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। এখানে এটি কেবল ব্যক্তির মনোভাব বা আচরণে বস্তুকে দেখা নয়, বরং গ্রামীণ জীবন ও জনপদকে একটি একীভূত জীবন্ত সত্তা হিসাবে দেখানোর কৌশলও বটে। *নক্সী কাঁথার মাঠ* কাব্যে বিলের দুপাশের দুটি গ্রাম 'ব্যক্তিত্ব-আরোপ' কৌশলেই হয়ে উঠেছে এক প্রাণবন্ত সমগ্র। এ কৌশলের সবচেয়ে শিল্প-সুন্দর ও অন্তরঙ্গ ফসল ফলেছে *বালুচর* কাব্যের 'উড়ানীর চর' কবিতায়। এখানে চরের বিভিন্ন উপাদান একেকটি প্রাণবন্ত সত্তা হিসাবে শোভমান হয়ে সমগ্র চরের জীবিতপ্রায় অস্তিত্বের সাথে নিটোল ঐক্যে মিলেছে।

৩

জীবন-জীবিকাকে গ্রামীণ পটভূমিতে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারা জসীমউদ্‌দীনের সম্পূর্ণতার এক দিক মাত্র। আরো আকর্ষণীয় দিক হলো, এই বিশেষ পটেই তিনি হাজির করেছেন নির্বিশেষ অনুভূতি — চিরন্তন 'মানবিক' বোধ। উদাহরণ হিসাবে অতি পরিচিত 'কবর' কবিতার উল্লেখ করা যায়। 'কবর' কবিতায় এক বৃদ্ধের আহাজারি ছোট ছোট কাহিনির আকারে প্রকাশ পেয়েছে। কাহিনিগুলো ধারাবাহিকভাবে না বলে কবি মাঝে মাঝেই ব্যক্তির হাহাকার আর করুণ অনুভূতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। যেমন, আত্মঘাতী হওয়ার আগ-মুহূর্তে পুত্রবধূর বিকল চিত্তের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বৃদ্ধের জবানিতে বলছেন :

তোমার বাপের লাঙল-জোয়াল দুহাতে জড়ায়ে ধরি,
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিনমান ভরি।
গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে,
ফাল্গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো-মাঠখানি ভরে।
পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি,
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গহীন সায়রে ডুবায়ে সকল গা। (কবর, *রাখালী*)

এখানে সার্বজনীন মানবিক অনুভূতি বেদনা যথাক্রমে প্রকৃতি, পথচারী আর গৃহপালিত পশুদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। বলদজোড়ার সাথে গৃহবধূর দুঃখের মিল একদিকে কৃষিনির্ভর যৌথজীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে, অন্যদিকে একটি জীবনপদ্ধতিকে সামগ্রিকভাবে হাজির করার মধ্য দিয়ে সমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করেছে। এভাবে বিশেষ বাস্তবতার যাবতীয় দাবি পূরণ করেও কবিতাটি দায় নিয়েছে নির্বিশেষ আকুতির।

এই আকুতি সর্বমানবিক তাৎপর্যে পৌঁছেছে কবিতার শেষ চরণে : 'ভেস্ত নাজেল করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত-প্রাণ'। মৃত্যুর ভার নিয়ে বাঁচার যে পরিচয় বৃদ্ধ নিজের জীবনে পেয়েছেন, তার সাপেক্ষে সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁর এই প্রার্থনায় মৃত্যু-শোক প্রগাঢ় মহিমা পেয়েছে।

প্রেম, বিরহ, মৃত্যু আর বেদনার শিল্পী তিনি। 'রাখালী' কবিতার বিরহ-কাতর দীর্ঘশ্বাসে তিনি শুরু করেন তাঁর প্রেমকাহিনি। *নক্সী কাঁথার মাঠ* কাব্যের আলোড়ন পেরিয়ে এই অভিযানের শ্রেষ্ঠ ফসলটি পাই *বালুচর* কাব্যে। তাঁর প্রেম অশরীরী নয়, আকাশ-কুসুমের চাষও নয়। ঘর-গেরস্থালির আশেপাশেই জমে ওঠে তাঁর হৃদয়বৃত্তির রহস্য। কিন্তু পৃথিবীর আর সব মহত্তম গানের মতো এই গানও — অনিবার্যত যেন — বিরহের গান। জসীমউদ্‌দীন তাঁর কবিত্বকে মুক্তি দিয়েছেন বিরহের বেদনায় — কখনো মৃত্যু কারণ হয় জমাট শোকের, কখনো সমাজ-শাসনের ইশারায় বিচ্ছেদ থেকে নেমে আসে বিরহের শোক।

কবি হিসাবে রোমান্টিক প্রবণতার সাথে তাঁর আত্মীয়তা খোলামেলা হয়ে উঠেছে *বালুচর* কাব্যের যুগল কবিতায় — 'কাল সে আসিবে' এবং 'কাল সে আসিয়াছিল'। যে আসবে কাল, তার জন্য কত কী আয়োজন! কত আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নবয়ন! বালুচরের বিস্তৃত অঙ্গন থেকে সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে কোমল, সবচেয়ে আবেগঘন অণু-পরমাণুর সুবেশ গ্রন্থনায় হৃদয়ের আর্তি-রসে প্রতীক্ষার প্রহর গোণা। কিন্তু মানবভাগ্যের এই তো সাধারণ পরিচয় — বর্তমানের প্রাপ্তি নয়, ভবিষ্যৎ বা অতীতের রোমন্থন — 'কাল সে আসিয়াছিল'।

তাঁর এই কাব্যপ্রবণতায় অনিঃশেষ ইন্ধনের মতো বহমান থেকেছে কোনো দূরাগত বাঁশির বিলাপ। 'বর্তমানের গ্রামীণ-রাখালকে জসীমউদ্‌দীন কখনও কখনও তাঁর কবিতায়

নিয়ে গেছেন পুরাণের আর এক রাখালের কাছে, নাম যার কৃষ্ণ। গ্রামীণ রাখাল আর পুরাণের রাখাল জসীমউদ্‌দীনের কবি-আত্মার আন্তর-বাসনায় পরিণত হয়েছে এক অখণ্ড সত্তায় — পল্লির রাখাল ছেলেই হয়ে ওঠে কৃষ্ণ, জলীর বিলের কোনো-এক গাঁয়ের রূপাই বৃন্দাবনের কৃষ্ণ হয়ে বাজায় বেদনার পৌরাণিক বাঁশি ...' (বিশ্বজিৎ ২০০২ : ৩৫)। সেই বাঁশির সুরে রূপ পায় শূন্যতা ও বিষাদের সাংগীতিক মূর্ছনা। এভাবে বাঁশি তাঁর কবিসত্তার রোমান্টিকতাকে প্রেম আর বিরহের 'প্রাচীন ছায়ায়' অর্থবহ করে তোলে।

বাংলার মরমী ভাবপ্রবাহে শূন্যতা ও হতাশার যে মিঠেকড়া ধারা আছে, জসীমউদ্‌দীন তাকে মান্য করেছেন বলেই মনে হয়। অকারণ বিষাদ আর হারানোর শঙ্কা তাঁর কবিতায় আছে; কিন্তু এর রূপটি নিতান্তই ঘরোয়া। যেমন, 'কাল সে আসিবে' কবিতায় :

> কাল সে আসিবে, নোঙর ছিঁড়িল, দুলিছে নায়ের পাল,
> কারে হারায়েছি, কারে যেন আমি দেখি নাই কতকাল।

ওই একই *বালুচর* কাব্যের 'মুসাফির' কবিতায় পল্লিপথের পটে এক ব্যক্তির অপ্রাপ্তিজনিত কান্না শোনা গেছে; তবে তার আকাঙ্ক্ষার ধরনটি পরিষ্কার নয়। এ ধরনের আবেগঘন বিষাদের কবিতাগুলোর মধ্যে *বালুচর* কাব্যের 'বাঁশরী আমার' কবিতাটি সবচেয়ে হৃদয়-সংবেদী :

> ফোটা সরিষার পাঁপড়ির ভরে,
> চরো মাঠখানি কাঁপে থরে থরে
> সাঁঝের শিশির দুটি পাও ধরে
> কাঁদিয়া ঝরে —
> বাঁশরী আমার হারায়ে
> গিয়াছে বালুর চরে।

অবশ্য কোনো অর্থেই অভিযোগপ্রবণ নন জসীমউদ্‌দীন। এক আশ্চর্য ঘাতসহ কবিসত্তা তাঁর — একমাত্র সন্তানের মৃত্যু, লাঠালাঠির বীভৎস আয়োজন, সাম্প্রদায়িক সংঘাতের আশঙ্কা — সবকিছুকে ঠিকঠাক জুড়ে দেয় বিশাল স্থানকালের প্রবহমান মানববিশ্বে। এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সুরেলা আবহ তাঁর সামষ্টিক জীবনযাত্রায় বাস্তবতার নির্মম কশাঘাত সত্ত্বেও অটুট থাকে শেষ পর্যন্ত।

এসব দিক থেকে কবি হিসাবে জসীমউদ্‌দীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয়। 'সংগতভাবেই কেউ কেউ তাঁকে রবিমণ্ডলির অন্তর্ভূত করেছেন' (আবদুল ১৯৯৩ : ৮৮)। কিন্তু আত্মীয়তা থাকার পরও রবীন্দ্রনাথ যে *বালুচর* কাব্যটি ভোগ করতে পারেননি, তার প্রধান কারণ এই দুই কবির কাব্য-ধারণার ফারাক। *বালুচর* পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'তোমার *বালুচর* পড়তে গিয়ে বড় ঠকেছি হে। বালুচর বলতে আমি তোমাদের দেশের সুদূর পদ্মাতীরের চরগুলির সুন্দর কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা আশা করেছিলাম। কেমন চখাচখি উড়ে বেড়ায়, কাশফুলের গুচ্ছগুলি বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু কতকগুলি প্রেমের কবিতা দিয়ে তুমি বইখানাকে ভরে তুলেছ' (উদ্ধৃত, সলিম ২০০৩ : ২৩০)। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা বেশ সরল। তাঁর এবং তাঁদের কাব্যে যে বস্তুর অভাব, জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় আগে

তিনি তা পেয়েছিলেন। *বালুচর* কাব্যেও তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু জসীমউদ্‌দীন কোনো অপূর্ণ কাব্যধারার ভাংতি ভরাট করার দায় নেননি। রচনা করেছেন আলাদা এক সম্পূর্ণ কাব্যবিশ্ব। ফলে প্রেম বা অনুরূপ মানবিক আবেগকে জীবনধারার বাইরে পৃথক কোনো অস্তিত্ব আকারে তাঁকে ভাবতে হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের কাছে পল্লিজীবন তাঁর প্রকৃতিরই অংশ। সেখানকার পাত্রপাত্রী যদি উঠে আসে তাঁর রচনায়, তাহলে তারা আচরণ করে রচয়িতার মানসলোকের প্রতিনিধি হয়ে। প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কটি তাঁর রচনায় অতি নিবিড়; কিন্তু তা কেবল তত্ত্বলোকের প্রশ্রয়েই তাৎপর্য পায়। তিনি প্রকৃতির দিকে তাকান, এবং অনুভব করেন প্রকৃতির সাথে মানুষের নিগূঢ় অভেদ; কিন্তু তাতে তাঁর মানুষ ও প্রকৃতি উভয়েই বাস্তবের তল ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে অ-লৌকিক — মাটি ও মানুষের কর্মকোলাহল দ্বারা যা সমর্থিত নয়। অন্যদিকে জসীমউদ্‌দীনের প্রকৃতি তাঁর কাম্য জীবনেরই বাস্তব অংশ। তিনি নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে প্রকৃতির দিকে তাকান না, বরং মানুষ ও প্রকৃতিকে যৌথজীবনে আবিষ্কার করেন। তাতে তাঁর মানুষের মতো প্রকৃতিও অতিশায়নের পরশে কাব্যিক হয়ে ওঠে; কিন্তু বাস্তবতার সীমা লঙ্ঘন করে না, কিংবা হয়ে ওঠে না কোনো তত্ত্বীয় অভিব্যক্তির ছায়া। প্রেম জসীমউদ্‌দীনের কাছে এমন কোনো কাব্যিক নিরীক্ষণের বিষয় নয়, যার স্বরূপ চিহ্নিত হবে পল্লি বা বালুচরের আভরণে। তাঁর আরাধ্য হলো একটি সম্পূর্ণ জীবন। তারই সীমানায় তিনি খোঁজেন, আবিষ্কার করেন, রূপায়িত করেন — চিরন্তন মানবীয় প্রেম। ফলে এই প্রেম উল্লাস বা বিরহের নির্বিশেষ সীমায় আরোহণ করলেও তার গতর থেকে বালির চিকচিকি কিংবা শস্যের ঘ্রাণ মুছে যায় না।[৫]

## ৪

গ্রামে যা নেই, তা সম্পর্কে এই কবি যেমন সম্যক ওয়াকিবহাল, যা কিছু বিদ্যমান, তা সম্পর্কেও নিগূঢ়ভাবে প্রত্যয়ী। অবশ্য ব্যাপারটি আদৌ কেবল থাকা-না-থাকার প্রশ্ন নয় — প্রশ্নটি একটি বিকল্প জীবনবোধের। জসীমউদ্‌দীনের গ্রাম যেহেতু একটি বিকল্প জীবনধারারই প্রস্তাবনা, তাই তাঁকে এই জীবনের আনন্দ-উল্লাস, শ্রী-শোভা, বিনোদন বা শিল্পিতার খোঁজ-খবরও নিতে হয়েছে। বাস্তবের সীমা লঙ্ঘন না করেই জসীমউদ্‌দীন তাঁর কবিতায় এসব ঐশ্বর্যের মজুদও যথেষ্ট রেখেছেন। ফলে তুলনামূলকভাবে দরিদ্র আর অনাড়ম্বর এই জীবনের বাঁকে বাঁকে উল্লাস আর মানসিক সম্পন্নতার কোনো ঘাটতি নাই। এ জন্য তাঁকে আয়োজন করতে হয়েছে, কিন্তু আরোপের দরকার হয়নি। তাঁর কবিতার রূপক বা অতিশয়োক্তি আসলে এই সম্পন্নতারই বার্তাবাহী। *রাখালীর* 'রাখাল ছেলে' কবিতার কয়েকটি যুগল চরণ পরীক্ষা করা যাক :

ক) ওই যে দেখ নীল-নোয়ান সবুজ ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর শিশির ধোয়ায় পা,

খ) সেথায় আছে ছোট্ট কুটির সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ-আকাশের ছড়িয়ে-পড়া আবীর-রঙে নাওয়া;

গ) ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে,
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।

ঘ) কাজের কথা জানিনে ভাই, লাঙল দিয়ে খেলি
নিড়িয়ে দেই ধানের ক্ষেতের সবুজ রঙের চেলী।

প্রথম অংশে শুধু সবুজ আর নীলে গ্রামখানি হয়ে উঠেছে স্বপ্নের মতো। পরের চরণে তাকে দেওয়া হয়েছে রাজকীয় মহিমা। চামর দোলানো আর পা ধোয়ানোর মতো রাজসিক কায়কারবারের জন্য মোটেই ধার-দেনা করতে হয়নি। দ্বিতীয় অংশে ছোট্ট কুটির একটা মনোরম ছবির আবহ তৈরি করে। কিন্তু সাঁঝ-আকাশে আবীর-রঙের এনতেজাম থাকায় সোনার পাতা মোটেই হেঁয়ালি মনে হয় না। তৃতীয় অংশ তো বাস্তবের প্রায় হুবহু অনুকরণ। প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপে মানুষের স্বপ্ন চারিয়ে দেয়ায় চরণ দুটি বেশ কতকটা অচেনা হয়ে উঠেছে। চতুর্থ অংশে আছে কাজ আর খেলার অভেদ। এখানকার দ্বিতীয় চরণের 'সবুজ' শব্দটি লক্ষ করার মতো। একে কেবল অতিশয়োক্তি হিসাবে পড়লে পাঠ চুকে যায় না। রঙটি নিশ্চয়ই ধানের চারার রঙ থেকে নেয়া। সেক্ষেত্রে কৃষকের স্বপ্নের দিক থেকে উৎপাদনের আনন্দ ও খেলার আনন্দের ঐক্য একটা বাস্তব ভিত্তি পায়।

এখানে তরুণ কৃষক, কৃষিজ উৎপাদন, প্রকৃতি আর বিনোদন এক সুতায় মিলেছে। এক অর্থে একে মিলিয়ে পড়া যায় এস এম সুলতানের ছবির সাথে। ফারাক এই যে, সুলতানের অতিশায়ন বাস্তবকে ভিত্তি হিসাবে মানেনি — প্রস্তাব করেছে সম্ভাব্য সভ্যতা। কিন্তু গ্রামীণ কৃষিসমাজে আস্থা, প্রকৃতির সান্নিধ্য আর উৎপাদনশীলতার জয়গান — এসব দিক থেকে দুয়ের মিল তাৎপর্যপূর্ণ। জসীমউদ্‌দীনের কৃষক অভিজ্ঞ প্রবীণ নয়, তরতাজা তরুণ। পেশীবহুল বা বিশালদেহী না হলেও তার পেটানো শরীরের সৌন্দর্য আর সামর্থ্যের কথা বারবার বলা হয়েছে। উৎপাদনশীল তরুণ আর উৎপাদিত ফসলের কলতানে তাঁর গ্রাম মুখর। তাঁর রচনার একাংশে উৎপাদনের রীতি-পদ্ধতির সাথে তারুণ্যের যেরূপ সহজ নৈপুণ্যের সম্পর্ক, তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, গ্রামকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদনশীল প্রাঙ্গণ হিসাবেই দেখেছেন কবি। অর্থাৎ, সুলতানের ছবিতে যেখানে সম্ভাব্য বাস্তবতার বলিষ্ঠতা, জসীমউদ্‌দীনে সেখানে বাস্তবের সম্ভাবনার সৌন্দর্য। এখানে হীনমন্যতার কোনো অবকাশ তো নাই-ই, বরং উলটা — আছে কাম্য জীবনের আহবান।

প্রকৃতি, উৎপাদন, উদ্‌যাপন আর মানানসই শিল্প-চর্চা — সবই কেমন জড়িয়ে-পেঁচিয়ে একাকার হয়ে গ্রামজীবনকে সম্পন্ন করে, তার নিটোল পরিচয় আছে *ধান খেত* কাব্যের 'পল্লী বর্ষা' কবিতায়। প্রথম স্তবকে আছে প্রকৃতি-রাজ্যের হদিশ। পরের দুই স্তবক চাষিদের একটি মিলনমেলার বর্ণনা দিচ্ছে — 'মোড়লের দলিজায়' একত্র হওয়া দলটির বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বয়ান। পরের স্তবকটি বরাদ্দ হয়েছে নারীদের জন্য। দুই চরণের শেষ স্তবক : 'আজিকে বাহিরে শুধু ক্রন্দন ছল ছল জলধারে / বেণু-বনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ, মন যেন চায় কারে' — সবার জন্য; হয়ত শুধু পল্লিবাসী নয়, মানুষমাত্রের কাছেই এ অনুভূতি মূল্যবান। মাত্র দুই পৃষ্ঠার ছোট্ট এই কবিতায় জীবনের সমগ্রতা আর সম্পন্নতার যে মূর্তি এঁকেছেন কবি তা যে পরিকল্পিত, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। আর এ কারণেই জসীমউদ্‌দীনের কাব্যপাঠে কবিতাটি প্রতীকের মর্যাদা পেতে পারে। গুরুত্ব বিবেচনায় এবং বিচারের সুবিধার জন্য নিচে কবিতাটির কয়েকটি অংশ তুলে দেয়া হলো :

কেউবা বসে বাখারী চাঁচিছে, কেউ পাকাইছে রসি,
কেউবা নতুন দোয়াড়ীর গায়ে চাঁকা বাঁধে কসি কসি। .....
লাঠির উপরে, ফুলের উপরে আঁকা হইতেছে ফুল,
কঠিন কাঠ সে সারিন্দা হয়ে বাজিতেছে নির্ভুল।
তারি সাথে সাথে গল্প চলেছে – আমীর সাধুর নাও,
বহুদেশ ঘুরে আজিকে আবার ফিরিয়াছে নিজ গাঁও। .....
বাহিরে নাচিছে ঝর ঝর জল, গুরু গুরু মেঘ ডাকে,
এ সবের মাঝে রূপ-কথা যেন আর রূপকথা আঁকে ! .....
বউদের আজ কোনো কাজ নাই, 'বেড়ায়' বাঁধিয়া রসি,
সমুদ্র কলি শিকা বুনাইয়া নীরবে দেখিছে বসি।
কেউবা রঙিন কাঁথায় মেলিয়া বুকের স্বপনখানি,
তারে ভাষা দেয় দীঘল সূতার মায়াবী নক্সা টানি।
বৈদেশী কোন্ বন্ধুর লাগি মন তার কেঁদে ফেরে,
মিঠে-সুরি-গান কাঁপিয়ে রঙিন ঠোঁটের বাঁধন ছেঁড়ে।

পরিষ্কার বোঝা যায়, বৃষ্টির ছুতায় মানুষগুলোকে ঘরে আটকে দিয়ে জীবনের যে 'রূপকথা' কবি বানালেন, তা কোনো চলমান বাস্তব নয়, বরং নির্মিত বাস্তবতা। খুচরা ও বিচ্ছিন্ন বাস্তবতা একত্র করে এই সমগ্র নির্মিত হয়েছে। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে, কেউ একজন কাঠ কেটে সারিন্দা গড়ছে। পরেই বলা হয়েছে, সারিন্দা নির্ভুলভাবে বাজছে। নিশ্চয়ই ঐ বৈঠকে সারিন্দা বানানোর পর সেই সারিন্দা বাজানো হয় নাই। বাজানো হয়েছে আলাদা সারিন্দা। তাহলে এই উল্লেখের একটাই তাৎপর্য হতে পারে — সারিন্দা গড়া আর বাজানোর মানুষ একই গোত্রভুক্ত। আর দরকারি কারুপণ্য ও 'অ-দরকারি' চারুপণ্যের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে তৈরি হয়নি। বৃষ্টির ঝর ঝর ধারা এবং মেঘের গুরু গুরু ডাকের সাথে তাল মিলিয়ে চলে যন্ত্রসংগীত এবং গল্পসাহিত্য। এই সংগীত ও গল্পের সাথে কোনো ঠোকাঠুকি তৈরি না করেই চলে জীবন ও জীবিকার নানা আয়োজন।

এই জীবনের খুব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নারীর সক্রিয়তা। পুরুষের দলে তারা নাই; তাই বলে কাজ আর আমোদের আয়োজনে পিছিয়েও নেই। চলছে শিকা বানানো, রঙিন কাঁথায় নকশার বুনন। এই কাজ তারা করছে কর্মহীন অবসরে। এই সংবাদ গ্রামবাংলার উৎপাদন-সম্পর্কে নারীদের তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। স্তবকটির শেষ দুই চরণ কাব্যতত্ত্বের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে গান মেয়েটির 'রঙিন ঠোঁটের বাঁধন' ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে, তা তার বিশেষ মানসিক অবস্থার কথাই বলছে। ঐ মানসিক আবেগ 'মিঠে-সুরি-গান' হয়ে বেরিয়ে আসা ব্যক্তির সাথে শিল্পের অনিবার্য অন্তরঙ্গতার লক্ষণ। সব মিলিয়ে পুরো কবিতাটিতে একটা প্রসঙ্গ বারবার বলা হয়েছে : উৎপাদকের সাথে ভোক্তার নিবিড় সহাবস্থানের কথা। একে নিছক কাব্যিক সৌন্দর্য ভাবলে ভুল হবে। এ এক বিকল্প জীবনপদ্ধতির সম্ভাবনা, যা হেরে গেছে, কিন্তু হারিয়ে যায়নি। 'আধুনিক' জীবনের বিচিত্র বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে এ এক ভিন্ন কোটির আদর্শায়িত প্রস্তাবনা, যার সাথে ঘনিষ্ঠ

আত্মীয়তা আছে মহাত্মা গান্ধীর 'চরকা' প্রস্তাবের।[৬] কাব্যিক আয়োজন ও রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে যে স্বাভাবিক ফারাক থাকার কথা এ দুয়ের মধ্যে সে পার্থক্য আছে; কিন্তু দুটিই আদর্শায়িত এবং বাস্তবের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন হলো, এই পুরা জীবনপ্রবাহে ব্যক্তি জসীমউদ্‌দীনের অবস্থান কোথায়? নিশ্চিত করে বলা যায়, তিনি এর ভেতরের অংশ নন। ভিতরে উৎপাদনসূত্রে সরাসরি যুক্ত থাকলে তাঁর উচ্চারণ ও দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হতো। সম্ভবত এত অতিশায়নের সুযোগ থাকত না। তিনি আছেন বাইরে। কিন্তু এ জীবনকে তিনি নিবিড়ভাবে জানেন। তাই এর প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল। আসলে একে সহানুভূতিও বলা যায় না। এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত বলেই তিনি এর পক্ষ নিয়েছেন। তাঁকে বলতে পারি গ্রামীণ জনপদের এক যোগ্য প্রতিনিধি। এ অবস্থান থেকেই শহরমুখো পল্লিবালককে তিনি আহবান করেছেন ঘরে ফিরে যেতে, আর নগরের মানুষকে নিমন্ত্রণ করেছেন গ্রামে।[৭] সমালোচকদের কেউ কেউ একে বিশ শতকের তৃতীয় দশকের কলকাতার বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে পড়েছেন। (সুনীলকুমার ২০০৪ : ৪৯-৫০)। এ সময় মন্দার প্রেক্ষাপটে নগরের সংকটাপন্ন মানুষেরা গ্রামজীবনের ব্যাপারে স্মৃতিকাতর হয়ে উঠেছিল এবং এক ধরনের আকর্ষণ বোধ করছিল। তাছাড়া ব্যাপকভাবে পল্লিসাহিত্য সংগ্রহ অভিযান এবং অসহযোগ আন্দোলনের 'গ্রামে ফিরে যাও' আহবানও অন্য অনেক কবির মতো জসীমউদ্‌দীনকে প্রভাবিত করেছিল। এই অনুমানে সত্য আছে বলেই মনে হয়। কিন্তু জসীমউদ্‌দীনের ক্ষেত্রে একটা বড় সত্য এতে বাদ পড়েছে। পূর্বোক্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি ছিল 'উপর থেকে নিচে' — অর্থাৎ উপরের নগরের আলো ছড়িয়ে পড়বে নিচের গ্রামে। কিন্তু জসীমউদ্‌দীনের প্রস্তাব একেবারেই আলাদা। তিনি শুরু করতে চান নিচ থেকে। আসলে তিনি একে নিচ বলেই মনে করেন না। কারণ, এখানেই আছে আলো। উলটা দিকে জমাট অন্ধকার।

## ৫

এবং এ কারণেই তিনি পক্ষ নিয়েছেন আলোকিত গ্রামজীবনের। আর নগরের সাথে তাঁর মোকাবেলাও খুব স্পষ্ট। সেই বিরোধে নগর ও গ্রামকে একেবারেই ভিন্ন জীবনাচার হিসাবে অঙ্কন করেছেন তিনি। নগরের বৈশিষ্ট্য এর কৃত্রিমতা, হিসাব-নিকাশের বাড়াবাড়ি, ভোগের অমিতাচার আর পাপাচার :

> হেথা যৌবন মেলিয়া ধরিয়া জমা-খরচের খাতা,
> লাভ লোকসান নিতেছে বুঝিয়া খুলিয়া পাতায় পাতা। ...
> মোদের মথুরা টলমল করে পাপ-লালসার ভারে,
> ভোগের সমিধ জ্বালিয়া আমরা পুড়িতেছি বারে বারে। (তরুণ কিশোর, *রাখালী*)

কিন্তু কবি জানেন, নাগরিক সচ্ছলতা আর আকর্ষণের কাছে দরিদ্র গ্রাম হার মানতে বাধ্য। পল্লির দুরবস্থার এক লম্বা ফর্দ দিয়েছেন তিনি *ধান খেত* কাব্যের 'রাখালের রাজগী' কবিতায়। যেমন, কৃষকের মুখে আজ আর ভাটির গান শোনা যায় না, সারা দিন কুড়িয়েও

অন্নের সংস্থান হয় না, দাবাড়ের গরু খাটাতে হয় জোয়াল টানার কাজে, নদীতে সারিগান আর শোনা যায় না, গরু-দৌড়ের মাঠখানিও ফসল ফলানোয় লাগাতে হয় ইত্যাদি। লক্ষণীয়, উৎপাদনব্যবস্থার ফাঁকে ফাঁকে উদযাপনের যেসব এনতেজাম গ্রামে ছিল, সেসবের অভাবকেই তিনি গ্রামের দুরবস্থার চিহ্ন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই দুরবস্থার কারণ কী ? না, এর উৎস গ্রাম নয়, বরং নগরই এই অধঃপাতের কারণ — নগরের শোষণ আর দুঃশাসন :

বাঁশীর শাসন হেলায় সয়েছি, বুনো ফলে দিছি কর,
অসির শাসন কি দিয়ে সহিব, বেচিয়াছি বাড়ি ঘর; .....
এত পেয়ে তোর সাধ মেটেনাক, দুনিয়া জুড়িয়া ক্ষুধা,
আমরা রাখাল মাঠের কাঙাল যোগাইব তারি সুধা! (রাখালের রাজগী, *ধান খেত*)

সাধারণভাবে জসীমউদ্‌দীনকে মনে হয় অরাজনৈতিক, যেমন মনে হয়েছে আবদুল মান্নান সৈয়দের কাছে (আবদুল ১৯৯৩ : ৯৭)। কিন্তু এই চরণগুলোতে ক্ষমতা-সম্পর্কের ভারসাম্যহীনতার ব্যাপারে যে তীক্ষ্ণ সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে, তাকে তো সুচেতন রাজনৈতিকতা না বলে উপায় নাই। সুশাসন আর দুঃশাসনের পার্থক্য নির্দেশিত হয়েছে এখানে। দুঃশাসনের অন্য নামই যে শোষণ সে কথাও পষ্ট করে বলা হলো। ফলে এটাও পরিষ্কার, ক্ষমতাবলয়ের অতিরিক্ত খাঁই মেটাতে গিয়েই উৎপাদনশীল পল্লি দিন দিন নিঃস্ব হচ্ছে। পরিস্থিতির এরূপ স্পষ্ট বয়ানের পর প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ ছাড়া কীই বা করার থাকে? –

শোনরে কানাই! পষ্ট কহিছি, সহিব না মোরা আর,
সীমার বাহিরে সীমা আছে যদি, ধৈর্যেরো আছে বার। ...
ভাবিয়াছ, মোরা গাঁয়ের রাখাল, নাই কোনো হাতিয়ার,
যে লাঙল পারে মাটিরে ফাড়িতে, ভাঙিতেও পারে ঘাড়। (রাখালের রাজগী, *ধান খেত*)

'রাখালের রাজগী' কবিতায় পুরানা জমানার কৃষ্ণকে কবি ক্ষমতাকেন্দ্রের প্রতীক করে তুলেছেন। এক সময় এই কেন্দ্র গ্রামেই ছিল। ফলে জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। স্বস্তি ছিল। জসীমউদ্‌দীন সচ্ছলতার চেয়ে সুখ ও স্বস্তিকে অনেক বেশি মূল্য দিয়েছেন। কানাই রাজ্যপাটসহ নগরে বসতি গড়লে, ক্ষমতাকেন্দ্রের স্থান গেল বদলে। বদলে গেল উৎপাদন-সম্পর্ক, বিলিবণ্টন আর যাপনের ধরন। এই নতুন ধরন যে কারো জন্যই মঙ্গলের হয় নাই, তা তো দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু সম্ভাবনা এখনো ফুরিয়ে যায়নি। গ্রামকে কেন্দ্র করে সেই সম্ভাবনার কথাই তাঁর উচ্চারণে প্রকট হয়েছে। গ্রামের জোয়ানকে তিনি আহবান করেছেন গ্রামে ফিরে যেতে :

ঘরে ফিরে যাও সোনার কিশোর! এ পাপমথুরাপুরী,
তোমার সোনার অঙ্গেতে দেবে বিষবাণ ছুঁড়ি ছুঁড়ি। (তরুণ কিশোর, *রাখালী*)

কিন্তু এ তো কেবল গ্রামের কিশোরের গ্রামে ফিরে যাওয়ার সহজ মামলা নয়। জসীমউদ্‌দীন চান খোদ ক্ষমতাকেন্দ্রকেই গ্রামে ফিরিয়ে আনতে। কেবল গ্রামকে বাঁচানো তাঁর লক্ষ্য নয়। বরং গ্রামই বাঁচিয়ে দিতে পারে মানবসভ্যতাকে :

পষ্ট করিয়া কহিছি কানাই, এখন সময় আছে,
গাঁয়ে ফিরে চল, নতুবা তোমায় কাঁদিতে হইবে পাছে। (রাখালের রাজগী, *ধান খেত*)

কানাইয়ের গ্রামে ফেরা শুধু ব্যক্তির ব্যাপার নয়। এ ফেরা তার রাজ্যপাট নিয়েই ফেরা। তাতে অসির শাসনের বদলে কায়েম হবে বাঁশির শাসন। কঞ্জুস নগরের হিসাবি যাপনের বদলে জারি হবে গ্রামীণ যাপনপদ্ধতির স্বস্তি।

জসীমউদ্‌দীনের এই রাজনীতি যে কতটা গভীর আর কাজের, সে পরিচয় পাওয়া যায় নাগরিক জ্ঞানকাণ্ড ও মূল্যবোধের সমালোচনায়। 'আধুনিক' সাহিত্যতত্ত্বও রেহাই পায়নি সমালোচনা থেকে। ব্যক্তির উৎপাদন হিসাবে ব্যক্তিগত সাহিত্যসৃষ্টির রেওয়াজকে তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন তাচ্ছিল্যভরে :

আমরা ত ভাই! ভেবে পাইনাক তোরি বা কেমন রীত,
একলা বসিয়া কেতাব লিখিস ভুলিয়া মাঠের গীত। (রাখালের রাজগী, *ধান খেত*)

আসলে এই সাহিত্যতত্ত্ব নাগরিক জ্ঞানকাণ্ডেরই অনিবার্য ফল, যে জ্ঞানের ভিত গড়ে উঠেছে বিপুল মানুষের বাস্তবকে পাত্তা না দিয়ে। 'মেনা শেখ' কবিতায় কবি সে কথাই খোলাসা করে বলেন। শিক্ষার নতুন সংজ্ঞা দেন। প্রশ্নটা উঠেছে মেনা শেখের শিক্ষার দৌড় নিয়ে। নাগরিক শিক্ষিত সমাজের মাপকাঠিতে এই গ্রাম্য সর্দার নিশ্চয়ই অশিক্ষিত। কিন্তু জসীমউদ্‌দীন ভিন্ন কথা বলেন। তাঁর বিচারে মেনা শেখ আসলে দরকারি নানা শিক্ষায় শিক্ষিত। সাত গাঁয়ের সাতশ বাড়ির লোককে সে পড়েছে; সোনার ধানে মাটির কোল ভরিয়ে দেয়ার কৌশল রপ্ত করেছে; হাজার চাষির কাজকারবার নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাপনা শিখেছে; জেনেছে প্রকৃতির বিচিত্র রঙ্গ আর মনে-প্রাণে বুঝতে শিখেছে অসহায় মানুষের নানান কিসিমের সুখ-দুঃখ। ফলে কেতাব পড়ে সে খেতাব পায়নি সত্য, কিন্তু পেয়েছে আরো বড় কিছু : 'হাজার চাষির হাজার লাঠি' তার এক হাঁকে উঠ্‌বস করে।

তাহলে 'আধুনিক' শিক্ষার সাথে — যার সাথে স্বয়ং কবির মোকাবেলা — মেনা শেখের শিক্ষার মূল তফাত জনজীবনের সাথে সংশ্লিষ্টতায়। এই ফারাকের ফল ফলেছে অন্তত আরো দুই জায়গায়। মূল্যবিচারে অর্থাৎ ভালো-মন্দ বিচারের নিরিখে এবং জনকল্যাণ সম্পর্কিত ধারণায়। জসীমউদ্‌দীন খুব পরিষ্কার করে বলেছেন, মূলত শিক্ষার দোষেই নগরের কলমবাজরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভালো-মন্দ বুঝতে পারছে না; বরং ক্ষতির কারণ হচ্ছে :

একটি ভিটেয় চরছে ঘুঘু তাহার নাকি অত্যাচারে;
জানি আমি কলম-পেশা! এই নিয়ে আজ দুষছ তারে।
হাজার ভিটেয় চরত ঘুঘু সে না থাকলে মোদের গাঁয়ে,
হাজার চালের খসত ছানি তোমাদের ওই কলম-ঘায়ে!
লাঠি তাহার মারে যদি — মাথায় তাহা বইতে পারি;
কলম দিয়ে যে মার মারো – ব্যথা তাহার বুঝতে নারি!
লাঠির আঘাত সারবে জানি দুদিন কিবা ছদিন পরে,

কলম দিয়ে কর আঘাত — সারবে না সে গেলেও গোরে।
জানিনে ওই ছাতার কলম কি দিয়েবা লও গড়িয়ে,
খোদার কলম রদ করেছো ওরই একটা আঁচড় দিয়ে। (মেনা শেখ, *রাখালী*)

জসীমউদ্‌দীনের প্রধান রচনাগুলো উপনিবেশ আমলে লেখা। কিন্তু এই শাসনের প্রত্যক্ষ উল্লেখ তাঁর লেখায় নাই বললেই চলে। 'রাখালের রাজগী' কবিতায় যে 'অসির শাসনে'র কথা বলা হয়েছে, তা হয়ত ঔপনিবেশিক শাসনেরই ইঙ্গিত। কিন্তু সে ইঙ্গিত মাত্র। আসলে এ হলো জালিমের শাসন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য শোষণ। উৎপাদনসম্পর্কের বিশেষ বিন্যাসেই গ্রাম শোষিত হয় নগর দ্বারা। শোষিত-লুণ্ঠিত মালের একটা অংশ যায় কাছের নগরে, অন্য অংশ — সম্ভবত বেশি অংশ — চালান হয় দূরের মেট্রোপলিটনে। গ্রামের দিক থেকে কিন্তু শোষণটাই সত্য। সে পরাধীন নগরের শোষণ হোক কি স্বাধীন নগরের। এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে জোর দিয়ে কেবল বলা যায়, এই শাসন অধিকতর অপশাসন বলে লুণ্ঠনের মাত্রাও অনেক বেশি।[৮]

কিন্তু 'মেনা শেখ' কবিতার উপরে উল্লেখিত অংশে পাই বাংলার ঔপনিবেশিক শাসনের গভীর পরিচয়। 'আধুনিক' বাংলা কবিতার ইতিহাসে এ বস্তু এত কম মিলবে যে, জসীমউদ্‌দীনের উচ্চারণ বিস্ময়করভাবে তুলনাহীন। আর কাজটি তিনি করেছেন মেনা শেখকে বা গ্রামীণ জনজীবনকে আদর্শায়িত না করেই। মেনা শেখ অত্যাচারী বটে। তার অত্যাচারে কোনো কোনো ভিটায় ঘুঘু চরেছে বৈকি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সে হাজার পরিবারকে বাঁচিয়ে দিয়েছে চূড়ান্ত সর্বনাশ থেকে। এখানেই আসে বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন মূল্যবোধের কথা। এই এক ঘরের সর্বনাশ নিয়ে 'কলম-পেষা'র দল মেতে ওঠে। অথচ তাদের কলমের ঘায়েই যে হাজার ভিটায় ঘুঘু চরে, সে সম্পর্কে তারা নীরব।[৯] জসীমউদ্‌দীনের অভিযোগটি মোক্ষম। ক্ষমতাসম্পর্কের সাথেই জ্ঞানের সম্পর্ক। আর জ্ঞানের সাথে মূল্যবোধের। ফলে এই মূল্যবোধ স্বভাবতই ক্ষমতাবলয়ের বাইরের বাস্তবতার ক্ষেত্রে সুবিচার করতে পারবে না। অথচ এই কলমবাজরা সুবিচারের দাবি করছে। লাঠির মারকেই তারা বড় করে দেখাচ্ছে। কিন্তু জসীম জানেন, লাঠির প্রত্যক্ষ বীভৎসতার তুলনায় কলমের দুর্বোধ্য আঘাত অনেক বেশি ক্ষতিকর। কলমধারী গুটিকতকের সাথে বিপুল জনতার অনতিক্রম্য দূরত্বই এই ক্ষতির মূল। আর এই দূরত্ব ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষ ফল। পরের কয়েক চরণে রচিত হয় বাংলার ঔপনিবেশিক শাসনের সংক্ষিপ্ততম কিন্তু সবচেয়ে নিখুঁত বয়ান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে মালিকানার নতুন ধরনের প্রচলন, অর্গানিক আইন ও রীতি-রেওয়াজের বদলে পশ্চিমা আইন বহাল করা, আর আরোপিত এই ধ্বংসাত্মক উৎপাদন-পদ্ধতি চালিয়ে নেয়ার প্রয়োজনে কলমজীবী শ্রেণির সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠা। এসব কথা বহুবার বলা হয়েছে, বহু কেতাবে এর ভালো-মন্দের খতিয়ান নেয়া হয়েছে, করা হয়েছে লাভ-লোকসানের হিসাব। কিন্তু এই পুরা প্রক্রিয়ার মধ্যে যে বিশাল শ্রেণিটি একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল, সেই প্রান্তীয় কৃষক সম্প্রদায়ের চোখ দিয়ে, তাদের ভাষায়, তাদের অনুভূতিতে করা বয়ান কোথায়? জসীমউদ্‌দীন এক চরণের মধ্যে আঁটিয়ে নিয়েছেন এই পুরা ইতিহাসের সারসংক্ষেপ — ঠিক সেইভাবে, যেভাবে তারা কথাটি বলবে : 'খোদার কলম রদ করেছো ওরই একটা আঁচড় দিয়ে'। এখানে কয়টি আরবি-ফারসি বা সংস্কৃত শব্দ আছে, কিংবা এর ক্রিয়াপদ প্রমিত কিনা — এসব জিজ্ঞাসা শুধু তুচ্ছ নয়, হাস্যকরও বটে। ঔপনিবেশিক

আইন-কাঠামো যে দরিদ্র কৃষকসমাজের জন্য ধ্বংসাত্মক হয়েছে, সে কথা সব পক্ষ থেকেই বলা হয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর নথিপত্রে এ উদ্বেগ শোনা গেছে, জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা এই ক্ষতির ফর্দও তৈরি করেছেন। কিন্তু সেসব তো ঐ কলমজীবীদেরই মামলা। তাদেরই ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা। জসীমউদ্‌দীন লিখলেন ভুক্তভোগীদের স্বরে ও সুরে, তাদের বাক্‌ভঙ্গি ও বাক্‌ধারায় — জুলুমকারীর প্রতি শ্লেষ আর মজলুমের জন্য করুণাও বাদ যায়নি।

৬

নাগরিক মানুষ হয়েও যে গভীর পাণ্ডিত্য আর সূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে জসীমউদ্‌দীন গ্রাম রচনা করেছেন, সেই গভীরতা ও সূক্ষ্মতার অন্তত আংশিক ভাগীদার না হয়ে তাঁর কবিতা পড়া সম্ভব নয়। পাঠেরও ইতিহাস থাকে। প্রভাবশালী তত্ত্ব আর বয়ানের অধীনে গড়ে ওঠা অভ্যাস ও রুচির বৃত্তেই সাধারণত পাঠ নিষ্পন্ন হয়। 'নজরুলের পর জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন দত্তকে আমরা যতটা আদর করেছি জসীমকে তেমন করি নাই। এটাকে অপরাধ ধরা যাবে না। রাজনীতি ও কবিতার সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা এতকাল কী ধারণা নিয়ে চলেছি আর হামেশা চলি তার মধ্যে এই অনাদরের কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। সেই ধারণা বা সেই ধারণা দিয়ে তৈরি নিক্তি জসীমকে ওজন কমিয়ে দেখায়। যে আড়তে তিনি বিক্রির জন্য ওঠেন সেখানকার বেপারিরা আলাদা। খদ্দের অন্যরকম। তিনি তো ভারে কম হবেনই' (ফরহাদ ২০০৪ : ৩৫৬)। জসীমউদ্‌দীন কিন্তু খুব সচেতনভাবেই এই 'অনাদরে'র পথ বেছে নিয়েছিলেন। *ঠাকুর-বাড়ির আঙ্গিনায়* গ্রন্থে লিখেছেনও সে কথা :

> পূর্বে রবীন্দ্র রচনার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিতাম, বহু কাগজে তাহা ছাপা হইয়াছে। এমনকি 'প্রবাসী' কাগজে পর্যন্ত আমার লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রাম্য জীবন লইয়া গ্রাম্য ভাষায় যখন কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম, কেহই তাহা পছন্দ করিল না। কাগজের সম্পাদকেরা আমার লেখা পাওয়া মাত্র ফেরত পাঠাইয়া দিতেন। সবটুকু হয়তো পড়িয়াও দেখিতেন না। সেই সময় আমার মনে যে কি দারুণ দুঃখ হইত, তাহা বর্ণনার অতীত (উদ্ধৃত, আবদুল ১৯৯৩ : ৮৬)।

বর্ণনাতীত দুঃখ পেয়েও তিনি তাঁর চর্চায় অবিচল রইলেন। কারণ, বাংলার 'খাঁটি' সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না।[১০] সাহিত্যের ঔপনিবেশিক আছর সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন বলেই করণীয় সম্পর্কেও তাঁর স্বচ্ছ ধারণা ছিল :

> ইংরেজ আগমনের পর ইউরোপের তীব্র মদিরা পান করে আমরা ধীরে ধীরে সব খোয়ালাম। খাঁটি ইউরোপের ভাবে বিভোর হয়ে সংস্কৃত অলঙ্কার ও শব্দশাস্ত্রের পানপাত্রে ভরে মাইকেল যে কাব্যরস আমাদের পরিবেশন করলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই তা নিঃশেষ হয়ে গেল। মাইকেল অবশ্য তাঁর অসামান্য প্রতিভার জন্য বেঁচে থাকবেন। ... মাইকেলের কাব্যধারাটি যে বাঙলাদেশে টিকল না, তার কারণ, বাঙলার মাটির সঙ্গে তাঁর কাব্যের ধারা শিকড় গাড়তে পারেনি। কিন্তু বিহারীলালের লিরিকের ধারাটি রবীন্দ্রনাথে এসে টিকে রইল। এর কারণ, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রয়েছে চারিশক্তির সমাহার, সংস্কৃত, বৈষ্ণব, বাঙলার লোকসঙ্গীত ও ইউরোপীয় ভাবধারার একত্র সমাবেশ। এইজন্য বাঙালি রবীন্দ্রনাথকে কতকটা গ্রহণ করেছে, কিন্তু মধু-হেম-নবীনের কাব্যের সঙ্গে বাঙলার মাটির যোগ নেই। গল্প বুননের যে ধারাটি

চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, রামায়ণ প্রভৃতি কাব্যে যেভাবে চলেছিল, মধু-হেম-নবীনের ধারা তার সঙ্গে কোনো যোগ রাখেনি। সেইজন্য বাঙলার মাটিতে তারা শিকড় গাড়তে পারেনি। (জসীম ২০০১ : ৩২-৩৩)

বুঝা যায়, ঔপনিবেশিক শাসন বাংলার প্রবহমান সাহিত্যধারায় যে বিজাতীয় সত্য তৈরি করেছিল, তার বিপরীতে জসীমউদ্‌দীন চেয়েছিলেন জাতীয় সাহিত্যের পুনরুদ্ধার। ভাষার দিক থেকে 'খাঁটি বাংলা'র পুনরুদ্ধারের প্রস্তাব আসলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর। আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'জাতীয় সাহিত্য' পুনরুদ্ধারের কাজে অনেক দূর এগিয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। জসীমউদ্‌দীন তাঁর নিজের মতো করে সে পথে হেঁটেছেন, এবং ব্যাপক সাফল্যের মধ্য দিয়ে রেখে গেছেন নতুন নির্দেশনা। বাংলা কবিতার পরবর্তী চর্চা সে নির্দেশনা অনুযায়ী চলবে — সাহিত্যের ইতিহাসে এমন দাবি অর্থহীন। কিন্তু পরের প্রজন্মগুলো যে জসীমউদ্‌দীনের অর্জনকে ভোগ ও ব্যবহার করতে পারেনি, তাতে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি বৈ লাভ হয়নি — এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

## টীকা

১. হাসান হাফিজুর রহমান দেখিয়েছেন, জসীমউদ্‌দীন 'বাংলা কাব্য ক্ষেত্রের বাঞ্ছিত ও প্রয়োজনীয় অসম্পূর্ণতার দায় পরিশোধের নায়ক হিসেবে পাঠক-মন জয় করেছিলেন' (হাসান ১৯৯৩ : ৩১৯)। এই নায়কত্ব কিন্তু অন্য পল্লিকবিদের উপর আরোপ করা হয় না।

২. 'জসীমউদ্‌দীন সচেতনভাবে তাঁর কাব্যে বৃন্দাবনের আধ্যাত্মিকতা কিংবা মধ্যযুগীয় রূপকথার অতিপ্রাকৃতকে বর্জন করেছেন' — মনসুর মুসার এ শনাক্তি (মনসুর ২০০৩ : ৯১) সম্ভবত যথার্থ; কারণ, চর্যাপদ থেকে লালন পর্যন্ত দুর্বোধ্য 'সান্ধ্য অলংকারে'র যে প্রবল প্রতাপ, জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় তার ছায়াও প্রায় পড়েনি।

৩. এখানে তিনজন সমালোচকের এ সম্পর্কিত মত উদ্ধৃত হলো : এক. আপাতদৃষ্টিতে জসীমউদ্‌দীনের ভাষা এলোমেলো, শিথিল ও অযত্নবদ্ধ মনে হতে পারে। সন্দেহ জাগতে পারে যে এই ভাষা নির্মাণের পেছনে কোনো প্রশিক্ষণ নেই — প্রস্তুতি নেই; তা পল্লী পথের বেনামী ফুলের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত। ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে জসীমউদ্‌দীনের কবিভাষার এই বৈশিষ্ট্যের মূলে একজন সচেতন শিল্পীর সজাগতাই কাজ করেছে। ... কৌতূহলের বিষয় যে, কবিতার উপকরণ পল্লী-জীবন সম্পর্কিত হলেও জসীমউদ্‌দীনের ভাষা আদৌ পল্লীমুখীন নয়। তাঁর স্বরবৃত্ত ছন্দ-নির্ভর কবিতায় যে-কথ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত, তাও নাগরিক। মাত্রাবৃত্তের এলানো ভঙ্গির জন্যে সাধু ক্রিয়াপদের প্রাচুর্য ঘটলেও তার সামগ্রিক আবেদনে সাধুভাষার জড়তা নেই, কেননা শব্দ-ভাণ্ডার মূলত তদ্ভব ও দেশি। (আবু হেনা ২০০৪ : ২২৬-২৭)

দুই. জসীমউদ্‌দীনের শব্দ ও ছন্দ ব্যবহারও সুচিন্তিত। শব্দ ব্যবহারে দেখা যায়, জসীমউদ্‌দীন কিছু গ্রামীণ ও আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগ করেছেন; কিন্তু ক্রিয়াপদ তাঁর সবসময়ই শালীন, সাধুরীতির। অজস্র দেশজ শব্দ ব্যবহার করে জসীমউদ্‌দীন আসলে শিক্ষিত বাঙালির — যার নিজের সঙ্গেও গ্রামের যোগ অনবচ্ছিন্ন — তাদের মন পেয়েছেন। (আবদুল ১৯৯৩ : ৯২)

তিন. তাঁর কবিতার মূল কাঠামো সাধুরীতির, আর তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যাপক প্রয়োগে রচিত হয়েছে তাঁর কবিতা। তিনি তৎসম শব্দের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন প্রবলভাবেই, পল্লীজীবন থেকে মুক্তি পেলে তিনি আশ্রয় নিতেন ওই শব্দেরই। ... কিন্তু তাঁর মূল শব্দভাণ্ডার — তৎসম ও তদ্ভব শব্দরাশি তাঁর কবিতাকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেনি, করেছে আঞ্চলিক শব্দাবলিই। ... তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দের অনুপাত স্থির করে নিতে পেরেছিলেন, এবং প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য। (হুমায়ুন ১৯৮৮ : ৫৯)

শব্দব্যবহার সম্পর্কিত মতই এখানে গৃহীত হল। বলা বাহুল্য, ভাষা, ছন্দ ও অলংকার সম্পর্কিত এঁদের মন্তব্যের ধরনও প্রায় অনুরূপ। এঁদের প্রথম দুজন জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে বেশ অনুকূল — চেষ্টা করেছেন তাঁকে 'আধুনিক'দের কাতারে শামিল করতে। তৃতীয় মন্তব্যে এই ভালোবাসা নাই, বরং নাক-সিটকানো একটা ভাব আছে। কিন্তু কবিতার শব্দ ও ভাষা সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিবেচনার ধরনে কোনো পার্থক্য নাই। তিনজনই 'আধুনিক' বাংলা কবিতার মানদণ্ডকে ধ্রুব ধরে জসীমউদ্‌দীনের শব্দস্বভাব বুঝতে চেয়েছেন।

৪. যেমন, হুমায়ুন আজাদের মন্তব্য : তিনি যখন মানব দেহ বা অঙ্গকে কোনো নিসর্গখণ্ডের সাথে তুলনা করেন, তখন বিস্তার ঘটে আবেগের; ... এবং এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে একটি অমর উপমা — 'মুখখানি তার নতুন চরের মত'। এ উপমাটি এত সরল ও স্বাভাবিক কিন্তু এত অসামান্য যে অনুভূতিতে বিস্তার ঘটে ব্যাপকভাবে। এটি উচ্চারণের সাথে সাথে মনে পড়ে জীবনানন্দের বিখ্যাত রূপক — 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'। ... দুজন দুপ্রান্ত থেকে বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন বিস্ময়করভাবে। (হুমায়ুন ১৯৮৮ : ৫৩)

লক্ষণীয়, এখানেও 'আধুনিক' কবিতার সাথে তুলনাই হয়েছে জসীমউদ্‌দীনের সাফল্য বিচারের নিক্তি। শব্দ, ছন্দ বা অলংকারের বিচ্ছিন্ন পাঠ মনে করিয়ে দেয় 'আধুনিক' কাব্যে ও কাব্যপাঠে ভঙ্গির প্রাবল্য। দুটিই জসীমউদ্‌দীনের কাব্যপাঠের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

৫. হাসান হাফিজুর রহমান জসীমউদ্‌দীনকে পড়তে চেয়েছেন 'আধুনিক' বাংলা কাব্যের 'সুগঠিত ও অগ্রসর' ধারার সাপেক্ষে। তা সত্ত্বেও তাঁর নিম্নোক্ত মন্তব্যে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যলোকের সম্পূর্ণতার সত্যটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে : 'জসীমউদ্‌দীন স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিত্ব হতে পেরেছেন এই জন্য যে, গ্রাম তাঁর কাছে এক পরিপূর্ণ বিশ্ব, তাঁর নিজস্ব শিকড় এর মধ্যে প্রোথিত। এক বিস্তৃত পারস্পেকটিভের মধ্যে লোকজীবনের তাৎপর্য তিনি বিধৃত করতে পেরেছেন, এর বর্তমান এর আবহমান ঐতিহ্যের সূত্রে তিনি গেঁথে তুলতে পেরেছেন এবং তিনিই প্রথম কবি যিনি গ্রামীণ উপকরণ শুধু নয়, এর ভাষা ও ভাব প্রকাশের মেজাজ, কল্পনাপ্রবণতা ও ভঙ্গিকেও বাংলা কাব্যের ইতিমধ্যে সুগঠিত ও অগ্রসর শিল্পসভ্যতায় আত্মমর্যাদাসহ স্বপ্রতিষ্ঠিত করেছেন' (হাসান ১৯৯৩ : ৩২১-২২)।

৬. গান্ধীর চরকা আন্দোলনের কথা যত বলা হয়েছে তত বুঝার চেষ্টা হয়েছে বলে মনে হয় না। পার্থ চট্টোপাধ্যায় The Moment of Manoeuvre: Gandhi and the Critique of Civil Society প্রবন্ধে এই প্রস্তাবের সার সংকলন করেছেন। (Partha ১৯৯৩)

৭. *ধান খেত* কাব্যের 'নিমন্ত্রণ' কবিতায় তাঁর এই অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে। এই কবিতায় প্রকৃতির ঔদার্যের মধ্যে পারিবারিক ও মানবিক সম্পর্কের মিষ্টি আবহে তিনি আহবান করেছেন নগরবাসীকে। এই অকুণ্ঠ আহবান এমন এক মেজবানের, পল্লির উপর যার রয়েছে অধিকারপ্রমত্ত অহংকারবোধ।

৮. উনিশ শতকের জাগরণ ও আধুনিক বাংলা কবিতার 'মূলধারা'র মধ্যে জসীমউদ্‌দীনকে পড়তে না পারার এ-ও এক কারণ। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী গালগল্প জসীমউদ্‌দীন বিশেষ আমলে আনেননি। ফলে জাতীয়তাবাদী আখ্যানের মধ্যে এমনকি — অন্য নানা অর্থে দলছুট — নজরুলকেও আঁটিয়ে ফেলা যায়; কিন্তু জসীমউদ্‌দীনকে নয়।

৯. তুলনীয় (কাজী ২০০৬) : মরলে কুকুর ওদের, ওরা শহীদ-গাথার বই লেখে! খবর বেরোয় দৈনিকে, আর একটি কথায় দুঃখ জানান, 'জোর মরেছে দশটা হাজার সৈনিকে'! (কামাল পাশা, *অগ্নি-বীণা*)

১০. "আমাদের কাছে অবাক লাগলেও এবং তাঁকে যেখানে-সেখানে 'পল্লীকবি' বলে গাল পাড়লেও নাগরিক নৈঃসঙ্গ্য সহ্য করার মত খাঁটি 'আরবান' মানসিকতা তাঁর মধ্যে ছিল বলেই পরবর্তী ত্রিশ, চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশকের 'আরবান কবিকুলের' যূথবদ্ধ গ্রাম্য অবজ্ঞাকে তিনি পাত্তা দেন নি।" (আল ২০০৪ : ২০৭)

## সহায়ক গ্রন্থ

কাজী নজরুল ইসলাম ২০০৬, *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
জসীমউদ্‌দীন ১৯৯১, *রাখালী*, নবম সংস্করণ, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা।
জসীমউদ্‌দীন ১৯৯৫, *নক্সী কাঁথার মাঠ*, ষষ্ঠদশ সংস্করণ, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা।
জসীমউদ্‌দীন ১৯৯৬, *সোজন বাদিয়ার ঘাট*, পঞ্চদশ সংস্করণ, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা।
জসীমউদ্‌দীন ১৯৯২, *সুচয়নী*, চতুর্থ সংস্করণ, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা।
জসীমউদ্‌দীন ২০০১, *কবি জসীমউদ্‌দীনের প্রবন্ধসমূহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা।
মনসুর মুসা সম্পাদিত ২০০৪, *জসীম উদ্‌দীন জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
মিঞা লুৎফার রহমান ও ফজলুল হক সৈকত সম্পাদিত ২০০৩, *জসীম উদ্‌দীন : ঐতিহ্যের অহংকার*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা।
সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ২০০৪, *জসীমউদ্‌দীন : কবিমানস ও কাব্যসাধনা*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৯৩, *আধুনিক কবি ও কবিতা*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
Partha Chatterjee ১৯৯৩, *Nationalist Thought and the Colonial World, A Derivative Discourse*, second impression, University of Minnesota Press, Minneapolis.

## সহায়ক প্রবন্ধপঞ্জি

আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৩, জসীমউদ্‌দীনের কবিতা, *করতলে মহাদেশ* গ্রন্থভুক্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা।
আবদুল মান্নান সৈয়দ ২০০৪, জসীম উদ্‌দীনের সাহিত্য-সাধনায় বাংলাদেশের লোকজীবন, সংকলিত, মনসুর ২০০৪।
আবু হেনা মোস্তফা কামাল ২০০৩, জসীম উদ্‌দীনের গদ্যশৈলী, সংকলিত, মিঞা ২০০৩।
আবু হেনা মোস্তফা কামাল ২০০৪, জসীম উদ্‌দীনের কবিতা : জীবন ও শিল্প, সংকলিত, মনসুর ২০০৪।
আল মাহমুদ ২০০৪, জসীম উদ্‌দীনের অহংকার, সঙ্কলিত, মনসুর ২০০৪।
দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৯৮, নক্সী কাঁথার মাঠ প্রসঙ্গে, সংকলিত, *জসীমউদ্‌দীনের নক্সী কাঁথার মাঠ সমালোচনা*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা।
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ২০০৩, পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন, সংকলিত, মিঞা ২০০৩।
ফরহাদ মজহার ২০০৪, নানানভাবে জসীমউদ্‌দীন পড়া, সংকলিত, মনসুর ২০০৪।
বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০০২, জসীমউদ্‌দীনের কবিতা : প্রসঙ্গ রাখাল, *জীবনানন্দ জসীমউদ্‌দীন এবং* গ্রন্থভুক্ত, অনন্যা, ঢাকা।
মনসুর মুসা ২০০৩, আবহমান পল্লীর রূপকার কবি জসীমউদ্‌দীন, সংকলিত, মিঞা ২০০৩।
সলিমুল্লাহ খান ২০০৩, জসীম উদ্‌দীন ও জাতীয় সাহিত্য, সংকলিত, মিঞা ২০০৩।
হুমায়ুন আজাদ ১৯৮৮, জসীমউদ্‌দীনের কবিতা : রচনাকৌশল ও শাব্দ অবয়ব, *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* গ্রন্থভুক্ত, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।